সৈয়দ আলী আশরাফের কাজ

ফাহমিদ-উর-রহমান

সৈয়দ আলী আশরাফের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে তিনি ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বিকল্প একটি সংস্কৃতির রেখাচিত্র নির্মাণ করার স্বপ্ন তার ছিল। এটি ছিল তাঁর দিক দিয়ে এক হিসাবে সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ। রাজনৈতিক বিদ্রোহের কথা তিনি ভাবেননি। কারণ তিনি জানতেন সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে যদি মানুষের অন্তর্জগতে পরিবর্তন আনা যায়, তবে রাজনৈতিক পরিবর্তন অবধারিতভাবে আসবে। সবার অলক্ষ্যে তাই তিনি মুসলিম দুনিয়ায় প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন সম্ভব না হয়, তবে মুসলিম দুনিয়ার আরদ্ধ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আসবে না। আর সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে যেটুকু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া গেছে তাও বিপন্ন হবে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আলী আশরাফ সাহেব শুধু প্রচলিত কলোনির শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন চাচ্ছেন না, তিনি এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা ভাবছেন যা হবে ইসলামের জীবনাদর্শনভিত্তিক। মুসলিম দুনিয়ায় কি ধরনের শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন তার প্রতিবেদন ও ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে আলী আশরাফ একেবারে প্রথম কর্তব্য হিসেবে যার উল্লেখ করেছিলেন তা অন্য কিছু নয়, সেটি হচ্ছে একটি বিশ্বাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা [Faith based education]। আবার শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে তিনি নতুন মানুষ তৈরি করার কথাও ভাবছেন। এইভাবে সাংস্কৃতিকভাবে নবচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠা মানুষ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াবে। আলী আশরাফ সাহেব সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার এই ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত ও উর্বর করতে চেয়েছিলেন শিক্ষার সংস্কার ও মুসলিম মানস তৈরি করার ভেতর দিয়ে।

> শিক্ষার ভিতর দিয়ে মুসলিম মানস তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন তার কাছে? কারণ কলোনির শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার ভেতর দিয়ে যে সংস্কৃতি দেশবাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠি করতে চায় তা হল পরাধীনতার সংস্কৃতি । এই পরাধীনতার সংস্কৃতি একালের মুসলমানের মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আলী আশরাফ সাহেব চেয়েছিলেন আজকের মুসলমানের মনোজাগতিক উপনিবেশকে শিক্ষার ভেতর দিয়ে নির্মূল করতে।

কলোনির শিক্ষা মানে হচ্ছে সেক্যুলার শিক্ষা। পশ্চিমারা এটিকে বড় আদরের নাম দিয়েছে আধুনিক শিক্ষা। এ শিক্ষা কি অর্থে আধুনিক এবং আমাদের সমাজের জন্য কতখানি উপকারী তা কখনও আমরা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিনি। আলী আশরাফ সাহেবই আমাদের মধ্যে প্রথম এ রকম শিক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং এই নীতি শিক্ষা দেয়া যে ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর, সেই অর্থে জাতির জন্যও যে শুভ নয় সে কথাটি তিনি সরাসরি বলেছেন। এ রকম শিক্ষার ক্ষতিকর প্রভাবটি নষ্ট করার জন্য পাঠ্যসূচীতে ইসলামের নীতি ও দর্শনের পাঠ নেয়া জরুরী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর এভাবেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং নিজের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে দিলেন।

সেক্যুলার শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য কী? ওহী বা প্রত্যাদেশভিত্তিক যে জ্ঞান, যার উপরে সব ধর্মের বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে তার

নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের চেতনার মুক্তি এবং এই শক্তিকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষকরণ বা সেক্যুলারাইজেশন। এ কালের পণ্ডিতরা বলে থাকেন সমাজের, রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তিমনের এই সেকুলারাইজেশন হচ্ছে মানব ইতিহাসে আধুনিকতার সবচেয়ে বড় অবদান। আবার এইখানে এসে আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাও মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পশ্চিমের পণ্ডিতদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া আধুনিকতা হয় না। অন্যদিকে আধুনিকতা সেক্যুলারাইজেশনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। ধর্মের যে আধ্যাত্মিক ভিত্তি আধুনিকতা তা স্বীকার করে না। মানুষের সাথে তার সৃষ্টি-কর্তার যে সম্পর্ক, যার ভেতর দিয়ে ধর্মের স্বরূপ উন্মোচিত হয় তা আধুনিকতার কাছে একান্তই গুরুত্বহীন। কোন মূল্যবোধই আধুনিকতার কাছে চূড়ান্ত নয়, সবই আপেক্ষিক। ধর্ম বলছে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ। আধুনিকতা বলছে মানুষ এসেছে এক জৈব বিবর্তনের পথ ধরে। ধর্ম বলছে সুদ নির্মূলের কথা। আজকের আধুনিকতা দাঁড়িয়ে আছে সুদী অর্থনীতির উপর। ধর্ম মানুষকে খলিফাতুল্লাহর [Vicegerent of God] মর্যাদা দিয়েছে। আধুনিকতা বলছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতার কথা। এই জীবন দৃষ্টির পার্থক্যের জন্যই আধুনিকতাকে ধর্ম পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ইসলামের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাকে হজম করা আদৌ সম্ভব হয়নি। সৈয়দ আলী আশরাফ সাহেব লিখেছেন:

"It is impossible to compromise between Islam and Secularism. Where Secularization means a modern scientific approach to knowledge and way of life no adjustment is acceptable. What the Qur'an says in a similar context is true. Muslims can not be modern in the above sense. They can not be a compromise between kufr and iman, faithlessness and faith, secularism and Islam." [New Horizons in Muslim Education]

আমাদের এখানে কেউ কেউ দাবী করেন ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ঠিক ধর্মহীনতা নয়। এ কথাটা স্রেফ অজ্ঞতার নামান্তর। ধর্মনিরপেক্ষতার যে মৌলিক দর্শন, যার উদ্ভব মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ ও রাষ্ট্রে পৃথকীকরণের ভেতর দিয়ে, তা কিন্তু ধর্ম বস্তুটাকে বরাবর পাশ কাটিয়ে যেতে আগ্রহী। এই জাতের ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের প্রতিদিনের জীবনধারাকে অর্থ, কাম ও উচ্চাশার গহ্বরে ঠেলে দেয়। এগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মের প্রতি উদাসীনতার এই সেক্যুলারিজম আমাদের সুকুমারবৃত্তি ও প্রবণতাগুলোকে ভোগবাদের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে রাষ্ট্র এই সেক্যুলারিজমকে সারকথা বলে গ্রহণ করতে চায়, তা কিন্তু অনায়াসে হয়ে উঠতে পারে দুর্নীতির প্রতারণাজাত কার্যসিদ্ধির ও সমবেত চরিত্র হননের মাধ্যম। ধর্ম না থাকলে নীতির খুঁটি মজবুত হয় না। পশ্চিমের ইঙ্গিতে আমাদের কালের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে সেক্যুলারিজম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার পরিণতি যে আমাদের কারও কাছেই আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠতে পারেনি তা তো চোখের সামনেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে আধুনিকতার শক্তির পেছনে যে প্রযুক্তির ভূমিকা রয়েছে তাকেই একালে আমরা ভেবে নিয়েছি সর্বশক্তিমান হিসেবে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহর সর্বশক্তিমানত্ব নিয়ে আমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে তৈরি করছে এক ধরনের ঔদ্ধত্য। অন্যদিকে ধর্ম বলছে, মানুষ প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার আল্লাহ প্রদত্ত। এই অনুভূতি মানুষকে নম্র ও বিনয়ী করে তোলে।

আজকের সেকুল্যার শিক্ষা তাই কতটা ঔদ্ধত্য ও দুর্বিনীত করে তোলার শিক্ষারও বটে। আধুনিকতার এই রূপের দিকে ইঙ্গিত করেই বোধ হয় ইয়েটস লিখেছিলেন : Things fall apart; the centre can not hold. আমাদের দেশে কলোনির সময় চালু হয়েছিল সেক্যুলার শিক্ষা। সেই শিক্ষার সুবাদে আমাদের এখানে অনেকেই সমাজের নানা স্তরে নানানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমের নীতি ও দর্শনের কবলে পড়ে তাদের মাথা একরকম ধোলাই হয়ে গেছে। তারা এখন নিজেদের ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজকেও ঐ পশ্চিমের চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই রকমভাবে দেখার ফলে সমাজের প্রকৃত ছবিটা তাদের চোখে ধরা পড়ে না। সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে তারা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই তারা পুরো সমাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। আর তখনই সমাজে শুরু হয় নানা রকমের বিশৃঙ্খলা।

অন্যদিকে আছে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার অনুসারীরা। এই দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা দু'টি জীবন দর্শনের প্রতীক। দু'টি ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে এ দু'টি ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ। তাই স্বভাবতই দু'টি ভিন্ন দর্শনাশ্রিত মানুষের লক্ষ্যও অভিন্ন হতে পারে না। মুসলিম দুনিয়ায় এ দু'টি পরস্পর বিরোধী মতানুসারীরা আজ রীতিমত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। আলী আশরাফ সাহেবের ভাষায়:

The two systems are creating conflicting groups who have already started fighting among themselves. [New Horizons in Muslim Education]

একালের সেকুলারিষ্ট ও ইসলামপন্থীদের এই দ্বন্দ্ব কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। এ অনেকটা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মতো। ইউরোপে ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যান্টদের লড়াই কিংবা উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের চেয়ে এ তীব্রতা আজকাল কোন অংশেই কম নয়। এই বিভেদ-বিভাজনের নীতি পুরো মুসলিম উম্মাহকে খণ্ডিত ও দুর্বল করে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদের বড় সাফল্য হচ্ছে মুসলিম সমাজের এই আদর্শিক বিভাজন। যার প্রেক্ষাপটে আজ মুসলিম দেশগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম একটা সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মুসলিম সমাজের আদর্শিক ঐক্য ও সংহতি দরকার। সেই ঐক্য ও সংহতি আসতে পারে এসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে। কলোনির চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বর্তমান চাহিদা ও আবেগকে নির্ভর করে এমন একটা ব্যবস্থার বিকাশ হওয়া দরকার যাতে যুগের প্রয়োজন যেমন মিটবে, তেমনি জনগণের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রবৃদ্ধির দিকটাও যথার্থ অর্থে প্রতিফলিত হবে। এ কারণেই আলী আশরাফ সাহেব শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে যেয়ে প্রযুক্তির মানবিকীকরণের কথা বলেছেন। শুধুমাত্র প্রযুক্তিক জ্ঞান মানুষকে দুর্বিনীত করে তোলার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। তাই প্রযুক্তিকে মানবীয় কল্যাণের পথে পরিচালিত হওয়া চাই।

আলী আশরাফ সাহেব লিখেছেন:
It is an attitude which must be changed from being one which is totally technological; to one which restrains science and technology and redirects it is an instrument for moral benefit. The humanization of technology is possible only if man accepts the principle that he must worship his Creator and not his own achievements, that he must live in harmony with nature and learn to control his passions and live without conflict or war or being swayed by policies of self-aggrandizement and love of power. [New Horizons in Muslim Education]

এমনি প্রেক্ষাপটে জ্ঞানের ইসলামীকরণের কথাটা এসেছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণের এই আন্দোলনে সৈয়দ আলী আশরাফ একালে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে গেছেন। মুসলিম দেশগুলোতে সেক্যুলার শিক্ষা কাজ করছে না, আর এ শিক্ষার ফলে মুসলিম উম্মাহ পরস্পর বিরোধী দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে হানাহানিতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এমন একটি শিক্ষা চাই যা শিক্ষার্থীর জীবনে, মননে, কর্মে ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ইসলামের মূল্যবোধকেই চূড়ান্ত বলে প্রতিষ্ঠিত করবে। যেহেতু সেক্যুলার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। আমাদের আংশিক প্রয়োজনই মাত্র পূরণ করে, আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতির সম্ভাবনা যেহেতু এর মাধ্যমে অসম্ভব এবং সবচেয়ে বড় কথা এই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক গোলামীকে একরকম কবুল করে নিচ্ছি; তাই মুসলিম দুনিয়ার জন্য এ কোন রকমই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই গোলামী থেকে মুক্তির স্পৃহার সঙ্গে যুক্ত আলী আশরাফের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। জ্ঞানের ইসলামীকরণ। যার লক্ষ্য তার ভাষায় :

The aim of education, according to the Ummah in general, is to produce a good Muslim who is both cultured and expert-cultured in the sense that knows how to use knowledge for his spiritual, intellectual and material progress, and expert in the sense that he is a useful member of the community[New Horizons in Muslim Education].

সৈয়দ আলী আশরাফের এই চেষ্টা নামকাওয়াস্তা ছিল না, ছিল অনেকখানি সংহত ও ফলপ্রসূ। শিক্ষার জন্য শুধু ক্যাম্পাস, দালানকোঠা কিংবা সুযোগ সুবিধার কথা না বলে তিনি কার্যকর অর্থেই ইসলামী কারিকুলাম তৈরি, টেক্সটবুক প্রণয়ন এবং ইসলামী নীতির আলোকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর কাজ করেছিলেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন এই সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক কাজগুলো সুসম্পন্ন না করা গেলে ইসলামী শিক্ষার ধারণা কার্যকরী করা কঠিন হবে। ইসলামী শিক্ষা তারাই দিতে পারবেন যাদের অন্তর ও মন একই সাথে ইসলামী নীতির আলোয় উজ্জীবিত, অন্যদিকে জ্ঞানের বিশেষ শাখায় যাদের থাকবে যথেষ্ট দখল ও কর্তৃত্ব। শুধুমাত্র কোরআন ও হাদীস জ্ঞানার্জনের উপর জোর দিয়েছে এই কারণে সব জ্ঞানই ইসলামী হয়ে উঠবে এমন ভাবা যেমন অমূলক- তেমনি কোন প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারোপযোগিতা বাড়ালেই সেটি ইসলামী রং ধারণ করবে সেটিও তেমনি ভুল। আলী আশরাফ সাহেব বলেছেন আজকের মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের নানা রকম জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করতে হবে শুধুমাত্র তা গ্রহণ বা অন্ধ অনুকরণ করে নয় বরং তার যথাযথ সমালোচনাও দরকার গ্রহণ-বর্জনের একটি সুনির্দিষ্ট ইসলামী নীতিমালার ভিতর। যখন এই বিষয়টি মাথায় রেখে কোন বিষয় নিয়ে টেক্সট রচনা করা যাবে তখনই তা কেবলমাত্র ইসলামী হয়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়া ছাড়া মুসলিম বিশ্বের শিক্ষায়তনগুলোর নাম সর্বস্ব ইসলামী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। এর বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্শক্তি ব্যতীত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এখান থেকে সত্যিকারের মুসলিম বেরিয়ে আসবে না।

ইরানী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ হোসাইন নসর সৈয়দ আলী আশরাফের এইসব কাজকে বলেছেন Intellectual Jihad- বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ। প্রকৃত অর্থেই একালের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এই জিহাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং এটি ছাড়া মুসলিম বিশ্বের ভাগ্যও ফেরানো সম্ভব নয়। আলী আশরাফ সাহেব নিজের জীবনে কাজে কর্মে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য এই নমুনা সৃষ্টি করে গেছেন। তার শিক্ষা দর্শন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাগুলো মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য এখনো উজ্জ্বল পথের ইশারা দিয়ে চলেছে।

আলী আশরাফ সাহেব মুসলিমবুদ্ধিজীবীদের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে আধুনিক পশ্চিমী জ্ঞানের মূলে যে দার্শনিক চিন্তাধারা রয়েছে তার প্রাচীর ভাঙ্গা যাবে না। আজকের পৃথিবীর সংগে খাপ খাওয়ানোর বিদ্যার কথা তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন, ইসলামের বিশ্ব দৃষ্টি ও এর শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে একটি নুতন পৃথিবী নির্মাণের, যেখানে বস্তুগত অগ্রগতি, নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ ও যুক্তিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের প্রতি বাধ্যবাধকতাও থাকবে। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম গাজ্জালীর পথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী ও মানুষের কল্যাণের জন্য জ্ঞানের উৎস বিশ্বাসের পুন:প্রতিষ্ঠা জরুরী বলে মনে করেছেন।

নবজাগরণের এই বিবেকী পথিকৃৎ ও বিদ্রোহী তাই রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি, সাম্রাজ্যবাদের তোয়াক্কা করেননি। তিনি ভেবেছেন তার উম্মাহর মুক্তির কথা, স্বপ্নের কথা। সেই অর্থে তিনি একজন বিশ্ব নাগরিকতাবাদীও বটে। ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি তাকে হাত ধরে নিয়ে গেছে ক্ষুদ্রতর গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতার বৃত্তে। এইভাবেই তিনি বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছেন যা মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, আর এক গোলামীর শিকলে বেঁধে ফেলে। সৈয়দ আলী আশরাফ এখানেই একটি পথের নির্দেশ রেখে গেছেন একালের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য।

সূত্রঃ সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ অক্টবর-ডিসেম্বর ২০০৬ (সৈয়দ আলী আশরাফ স্মরণ)

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)